International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-IV, July 2022, Page No. 01-06
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i4.2022.01-06

মধ্যবিত্তের সমাজ আলেখ্য ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন'

তরুণকান্তি মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরসুনা কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Jyotirindra Nandi is a reclusive author with a habit of pondering into loneliness. In his wonderful novel 'Baro Ghor Ek Uthon', he has been very objective and realistic in presenting depreciated and decayed chapters of Bengali lives during the Post World War II period. This novel is a documentation of poverty, unemployment, economic decadence, and disruptions in personal and familial relationships. Nature has gradually fled from this city of concretized forest; likewise, the inhabitants of this city too have gradually lost their benevolence of perception and freedom of thoughts. How much inhuman a group of individuals can be due to poverty has been reflected in this novel. The wheel of time gave birth to an age where there was but one struggle i.e. to survive. The middle class people of newly liberated Kolkata, learned to free themselves from the slough of reverence and gentility, and they took to protest and rebel being ignited by their poverty and hunger. Jyotirindra Nandi's 'Baro Ghor Ek Uthon' is an exceptional creation of Bengali Literature centred in this catastrophe.

Keywords: middle class, Kolkata, poverty, unemployment, economic cadence, freedom, family, values, etc.

জ্যোতিরিন্দ নন্দী বহুপঠিত লেখক ছিলেন না। প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকার লেখক হওয়া সত্ত্বেও পাঠকের দিক থেকে খুব একটা সাড়া পাননি কোনওদিন। নিস্পৃহ শীতলতাই তিনি আজীবন পেয়েছেন। তাঁর বইয়ের কাটতি ছিল কম। লেখক হিসাবে আর্থিক স্বচ্ছলতাও তাঁর অনায়ত্ত্ব থেকে গেছে। প্রচলিত অর্থে তাঁকে সফল লেখক বলা যায় না। কারণ, বাজার ব্যবস্থায় বইয়ের কাটতি, লিখে রোজগার তথা আর্থিক সাফল্যই শিল্প বিচারের একমাত্র মানদণ্ড। আর সেই বিচারে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর পূর্বসুরী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দ দাশের মতই ডাহা ফেল। জ্যোতিরিন্দ নন্দী নিঃসঙ্গ উদাসীন স্বভাবের লেখক। প্রথম থেকেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পাঠকনন্দিত লেখ ছিলেন না। লেখক জীবনের শুরুতে তাঁর চোখেও স্বদেশ গঠনের স্বপ্ন ছিল, জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল। প্রাথমিক পর্বে তাই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী শুধু পাঠকদের নয়, শাসক ইংরেজদের নেক নজরেও পড়ে গিয়েছিলে। ১৯৩১ সালে মাত্র আঠারো বছরের তরুণ জ্যোতিরিন্দ্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। চার মাস পরে জেল থেকে ছাড়া পেলেও এক বছর বাড়িতে অন্তরীণ থাকতে হয় এবং তাঁর সাহিত্যচর্চার উপরও নজরদারি করা

হয়। তাতেও লেখালেখি অবশ্য থামাননি। জ্যোৎস্না রায় ছদ্মনামে 'সোনার বাংলা' ও 'বাংলার বাণী' পত্রিকায় বেশ কিছু গল্প লেখেন। তারপর এপারে চলে আসা, উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ানো, পত্র-পত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে চাকরি ও আশ্রয়ের খোঁজ করতে করতে একটু ধীরে চল গতিতে লিখে চলেন। ইতিমধ্যে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা সর্বোপরি নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন-জটিলতা, স্বার্থ-সর্বস্বতা লেখককে করে তোলে কিছুটা পলায়নপর, পরে অবশ্য তিনি মধ্যবিত্তের আবর্তে বন্দি হয়ে পড়েন। গত শতকের চল্লিশ থেকে সত্তর-আশি দশক পর্যন্ত নাগরিক মধ্যবিত্তের যাপন ক্রিয়ার মধ্যেই নানা প্রকারে স্বাধীনসত্তার সন্ধান করে গেছেন। এই কথাশিল্পীকে বাণিজ্যিক মহল অথবা প্রগতিশীল লেখক-পাঠকবন্ধুরা নীরবে তাঁকে উপেক্ষা করে গেছেন। নিঃসঙ্গ লেখক চোখের সামনে দেখেছন সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত আরো অনেকেই ঈর্ষণীয় পাঠক ও খ্যাতি পেয়ে চলে গেছেন। সমসাময়িক অথবা তরুণ লেখকরা অল্পসময়ে জনপ্রিয়তা থেকে বড়ো বড়ো পুরস্কারেও ভূষিত হচ্ছেন। বন্ধু সাগরময় ঘোষ তাঁর প্রতিভাকে চিনতে পেরে তাঁর লেখাকে দীর্ঘদিন প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন।

বিংশ শতাব্দীর চারের দশক থেকে বাংলার রাজধানী কলকাতার ওপর দিয়ে গেছে হাজারো দুর্যোগের তরঙ্গ বিক্ষোভ। ১৯৪২-এর পর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭-এর দেশভাগের কারণে সৃষ্টি হওয়া উদ্বাস্তু সমস্যা ক্ষমতাকে স্পর্শ করেছিল প্রবলভাবে। পাঁচের দশকে এই সমস্ত ঘটনার অভিঘাত কলকাতাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নাড়িয়ে দেয়। কলকাতার নাগরিক জীবনের মধ্যে এর রেখাপাত দেখা যায়। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক ও মানিসক জগতেও এর প্রভাব গভীর ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। স্বাধীনতা উত্তরকালে কলকাতা বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কলকাতার কলেবর বৃদ্ধি ঘটেছে। কলকাতা নগরের সম্প্রসারণ প্রাথমিক পর্যায়ে ঘটেছিল বিত্তশালীদের অভিজাত পল্লি গড়ো তোলবার স্বাভাবিক সমাজবিজ্ঞানের নিয়মে। শহরের কোলাহল থেকে খানিক দূরে নিরিবিলি খুঁজতে চেয়েছিলেন তাঁরা। ফলত কলকাতার চারিদিকে জন্ম নিতে থাকে নতুন নতুন শহরতলি। পূর্ববঙ্গের শরণার্থী এবং কলকাতার আর্থিক বিপর্যস্ত মানুষের মাথা গোঁজার জন্য গড়ে উঠতে থাকে বস্তি। কলকাতার জীবনের যাপন পদ্ধতি নতুন খাতে বইতে শুরু করে। সম্ভ্রম, ভদ্রতার আপাত খোলস ছেড়ে সদ্য স্বাধীন কলকাতার মধ্যবিত্ত জনতা সেদিন কেবল পেটের জন্য সংগ্রামী হয়।

এই বিপর্যয়কে নিয়ে বাংলা ভাষায় একাধিক সাহিত্য রচিত হয়েছে। তার মধ্যেই অন্যতম একটি ব্যতিক্রমী সৃষ্টি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাস। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক সমকালীন বহুমাত্রিক সমস্যাকে চিত্রিত করেছেন। লেখকের ছোটগল্প, উপন্যাস সম্পর্কে একটি নিজস্ব ধারণা ছিল—

> ''আমি মনে করতাম গল্পগুলি হল এক এক খণ্ড ইঁট। আর উপন্যাস হল একটা প্রকাণ্ড ইমারত। সুতরাং ইঁটের পর ইঁট গাঁথার মতন আমি আমার গল্পের চরিত্রগুলি সাজিয়ে দেব। সেই সঙ্গে সিচুয়েশনের দরজা জানলা জুড়ে দেব, ঘটনার সিঁড়ি থাকবে বারান্দা থাকবে। তার ওপর স্টাইলের পলেস্তারা পড়বে এবং তারপর ভাষার রং।''[১]

তাঁর প্রথম তিনটি উপন্যাস 'সূর্যমুখী', 'মীরার দুপুর', 'বারো ঘর এক উঠোন'-এর ভিত্তিতে রয়ে গেছে তাঁরই লেখা একটি গল্পের ইঁট 'তারিণীর বাড়ি-বদল'। 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসের জন্মের পিছনেও রয়েছে এরকমই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। পারিবারিক সূত্র থেকে জানা যায়, তাঁর মেয়ের যখন চার বছর বয়স, তখন একদিন স্ত্রীকে এসে বলেন, বেলঘরিয়ার একটি বস্তিতে গিয়ে থাকতে চান শিখবার জন্য। সেই

বস্তিতে ছিল এগারোটি ঘর, একটি কমন উঠান। বস্তিবাসীদের মধ্যে কেউ কাজ করতেন দোকানে, কেউ আবার ছিলেন নার্স, বেশিরভাগ মানুষই এসেছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে। এই সমস্ত মানুষদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই ঔপন্যাসিক উপন্যাসের রসদ পেয়েছিলেন।

'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসের মূল প্লট আর্থিক বিপর্যয়। শিবনাথ দি গ্রেট হিমালয়ান ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ব্যাঙ্ক ফেল করে তার চাকরি যায়। কে গুপ্ত মার্চেন্ট ফার্মের মোটা বেতনের কর্মচারী। বলাইয়ের নিজস্ব দোকান ছিল বাজারে দেনার দায়ে তা বিক্রিত। অমল এক ছাঁটাই কর্মচারী, ভুবনবাবু বড়বাজারের দোকানের মালিক ছিলেন কিন্তু আজ নিঃস্ব। বারো ঘরের পুরুষদের মত নারীরারও নিজেদের রূপান্তর ঘটায়। সনাতনবৃত বা নম্রতা, সহনশীলতা বর্জন করে আর্থিক উপায়ে তারা পুরুষের সমার্থক হয়ে উঠতে চায়। তারা বেড়িয়ে পরে বিভিন্ন কর্মে; রুচি শিক্ষিকা, কমলা নার্স, বীথি বাচ্চার আয়া, প্রীতি টেলিফোন অপারেটর। এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে দেশবিভাগ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তীকালে অবক্ষয়িত জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। নতুন নতুন জীবিকা, নতুন শ্রেণিবিন্যাস উপন্যাসে একের পর এক ভাঙন এনেছে।

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলা কথাসাহিত্যে কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল মধ্যবিত্ত মনোবিশ্লেষণ। সময়ের পঙ্কিল স্রোতে দেখা দিয়েছিল অদ্ভুত পতন। নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ন্যায় ও অন্যায়, পাপ ও পুণ্য, ধর্ম ও অধর্ম, শুভ ও অশুভ, ভালো ও মন্দ ইত্যাদির মধ্যবর্তী দূরত্ব ঘুচে যেতে থাকে। একটার পর একটা সংকটে আক্রান্ত জীবনও তখন তার যাবতীয় কার্যকরী ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে নিছক এক প্রহসন ও বিভ্রমের পতনচিহ্ন হয়ে উঠেছে। চারিদিকে শুধু অবক্ষয় আর অবক্ষয়। বারো ঘর এক উঠোন উপন্যাসে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মূলত এই অবক্ষয়জাত পতনচিহ্নের আপোষ প্রবণতাকেই ধারণ করলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎকেন্দ্রিক উন্মাদনায় গোটা বিশ্বঅর্থনীতি তলে তলে ভেঙে পড়েছিল। একদিকে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি— এই দুইয়ের মিশ্রিত প্রভাবে নাগরিক মানুষের জীবনে এক ধরনের বৃহৎ সংকট নেমে এসেছিল। সাধারণত নাগরিক জীবনে বসবাসকারী প্রত্যেকটি মানুষই চায় সামাজিক আভিজাত্য। এই আপাত সামাজিক আভিজাত্য স্থায়ী অর্থনীতি ব্যবস্থা ছাড়া কোনোমতেই সম্ভবপর নয়।

ভেঙে পড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, সেই চলমান সময়বাস্তবে সবচেয়ে বেশি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ হয়ে উঠল চাকরি। এর ফলে চাকরিপ্রার্থী শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। বিভ্রমের অদ্ভুত বাস্তবতায় ক্রমশই মূল্যবোধের অবক্ষয় শুরু হয়ে গেল। সবচেয়ে বড়ো কথা— এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিক মূল্যবোধহীন মানসিকতা সমাজজীবনের সর্বস্তরে সক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ল। ভেঙে পড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, সেই সময়, সেই চলমান সময় বাস্তবে।

শুধুমাত্র চাকরি প্রার্থী উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই স্বপ্নভঙ্গজনিত হতাশায় আক্রান্ত হল না— সেই সঙ্গে চাকরিরত স্বচ্ছল মধ্যবিত্তদের সামনেও হঠাৎ করে বিপদ ঘনিয়ে উঠল। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে একের পর এক মার্চেন্ট কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেল, একের পর এক ব্যাঙ্কের ভরাডুবি ঘটে গেল। ফলে যারা নিরুদ্বিগ্নে চাকরি করছিল— হঠাৎই চাকরি চলে গেল তাদের। সামাজিক আভিজাত্যের নাগরিক উচ্চতা থেকে নিচে নেমে আসতে বাধ্য হল তারা। চাকরি না পাওয়ার জীবন একরকম, কিন্তু চাকরি পেয়েও হারানো আরও ভয়ঙ্কর। ফলত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি একদিকে যেমন এ হেন আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়কে মন থেকে একেবারে মেনে নিতে পারছিল না, অন্যদিকে তেমনই তৈরি করা আপাত উচ্চাশার খোলশটাকে ছিঁড়ে অন্যসকলের মাঝে নেমে এসে যেমন তেমনভাবে জীবন কাটাতেও পারছিল না। তাছাড়া এতদিন ধরে

চাকরি করার সুবাদে তারা যেভাবে নিজেদের একটা আত্মকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন সমাজের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিল, সেই বিচ্ছিন্নতা বোধ থেকেও কিন্তু তারা কিছুতেই নিজেদের মুক্ত করতে পারছিল না।

'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসটিকে বিচার করবার সময় এর মধ্যে থাকা দ্বন্দ্বটিকে আবিষ্কার করা সবচেয়ে জরুরি উপন্যাসটি মূলত চরিত্রপ্রধান। বারোটি পরিবার এবং পরিবারের বাইরে একাধিক পুরুষ ও নারী চরিত্রকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে লেখক চিত্রিত করেছেন। এই সমস্ত চরিত্রের শ্রেণি অবস্থান এক নয়, কিন্তু প্রধান চরিত্রগুলি সকলেই কোনো না কোনো ক্রাইসিসে ভুগছে। নির্দিষ্ট একটিমাত্র চেহারা নয়, একাধিক সংকট এই চরিত্রদের ঘিরে ধরেছে প্রতি মুহূর্তে। উপন্যাসটি চরিত্রপ্রধান নয়, সমস্যাপ্রধান বলা যেতে পারে। লেখক শ্রেণিচেতনার চেনা অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে নতুন ভাবে সমাজকে ধরতে চেয়েছেন, উপন্যাসের বিভিন্ন পরিবার ও সেই পরিবারের মানুষের জীবনচর্যার মধ্যে দিয়ে লেখক মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থান, পারিবারিক মূল্যবোধ, নারীর অবস্থান দেখিয়েছেন। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে স্বাধীনতা উত্তর বাংলায় নেমে আসে গভীর বিপর্যয়, ফলত মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী ও কর্মজীবী মানুষের জীবনে নেমে আসে ছাঁটাইয়ের আঘাত। রাতারাতি শ্রেণিচ্যুত হয়ে পড়েন প্রচুর মানুষ। এরই সঙ্গে ছিল পূর্ববঙ্গে থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষের দল। তাঁরাও তাঁদের ফেলে আসা স্বচ্ছলতাকে হারিয়ে মাথা গোঁজবার ঠাঁই খুঁজছিলেন নতুন দেশে। নিজেদের জীবনের যাপিত মুহূর্তগুলো নিজেদের কাছেই দুঃস্বপ্ন হয়ে যায় তাঁদের। এই দুর্যোগের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখি বারো ঘরের সকল অধিবাসীকেই। কেউ খোয়ায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের চাকরি, কেউ হারায় পদমর্যাদা। কেউবা নিজের চালু ব্যবসা ছেড়ে ফেরিওয়ালা হতে বাধ্য হয়। কেউবা দেশভাগের ফলে এদেশে আশ্রয়ের সন্ধানে আসে। মানুষের অন্যতম প্রধান মূল চাহিদা মাথা গোঁজবার ঠাঁই জোটাতে তাই সকলকে আশ্রয় নিতে হয় বস্তিতে। এই অর্থনৈতিক সংকটের বর্ণনা দিতে লেখক শিবনাথকে আপাততভাবে কথকের ভূমিকায় হাজির করিয়েছেন। মূলত তাঁর চোখ দিয়েই এই উপন্যাস পাঠকের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে। উপন্যাসের শুরুতে শিবনাথের জবানিটা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করবার মতো। রুচি শিবনাথকে পঞ্চাশ টাকা দিতে পারে এমন বন্ধু না থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শিবনাথ জানায়—

> ''ছিল, যবে দি গ্রেট হিমালয়ান ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলাম, রুচি! তা অতবড় আটতলা বাড়িটার ব্যাঙ্কটাই যখন ডুবল, লোকের চোখে হারিয়ে গেল, আমি মাত্র দু'পদ দু'হাতে ও একটি ক্ষুদ্র মস্তকবিশিষ্ট মানুষ হয়ে কী করে আর বন্ধুদের কাছে আদরের 'শিবু' হয়ে অনন্তকাল পরিচিত থাকব আশা করো।''[২]

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলার এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে সৃষ্টি হয় তীব্র বেকার সমস্যা। সমস্ত সমাজকে গ্রাস করে তীব্র হতাশা। মধ্যবিত্ত নামক মানসিকতার মধ্যেও ঘটে যায় স্পষ্ট দুটি শ্রেণিবিভাগ— একটি উচ্চমধ্যবিত্ত, অন্যটি নিম্নমধ্যবিত্ত। বাসস্থানের অভাব, দুর্ভিক্ষ, বেকার সমস্যা আর তার সঙ্গে ভাল-মন্দ, ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবকিছু মিলে গিয়ে তৈরি হচ্ছিল এক জগাখিচুড়ি সমাজব্যবস্থা। এই উপন্যাসের মধ্যে লেখক সেই মিশ্রণেরই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে আধুনিক জীবনের দুই প্রতিভূ দেখা যায়— চারু রায় ও বস্তির মালিক পারিজাত। চারু রায় সিনেমার নারী চায়। দেশভাগ তাকে সাহায্য করে। অন্যদিকে পারিজাত উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার প্রচুর সম্পত্তি পায়। সে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বস্তি ভেঙে আবাসন তোলে। শিবনাথ গল্পের নায়ক, গল্পের কথক, গল্পের চালিকাশক্তি। শিবনাথ দি গ্রেট হিমালয়ান ব্যাঙ্কে চাকুরি করত।

চাকরী চলে যাওয়ার পর স্ত্রীর রোজগার একশ টাকা মাইনেতে বেলেঘাটার বস্তিতে চলে আসে। শিবনাথ বেকারত্ব জ্বালায় চিন্তিত নয়, কারণ সে জানে এক সময় ভদ্রস্ত চাকরি আবার পাবে তাই পুরনো পরিচয়কে সবার সামনে ধরে। উপন্যাসে পর্দাপ্রথা প্রতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, বস্তিতে কারুর ঘরে পর্দা ছিল না, একসময় শিবনাথের পর্দাও ফুটিফাটা হয়ে যায় বাইরের খোলস খুলে যায়। বেকার হয়েও শিবনাথ গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়, চাকিরর চেষ্টা করে না এমনকি টিউশন পড়িয়ে উপার্জনের কথাও ভাবে না। শিবনাথের স্ত্রী স্কুল শিক্ষিকা। কিন্তু বন্ধুর কাছে ঝুরি ঝুরি মিথ্যা কথা বলে টাকা ধার করতে বিবেকে বাধে না। বিধু মাস্টারকে সে ঘৃণা করে কিন্তু বস্তির মালিক পারিজাতকে তোষামোদ করে। পারিজের স্ত্রী দীপ্তি তাকে 'বস্তির লোক' বললে শিবনাথের কান লাল হয় অথচ দীপ্তিকে রাতের স্বপ্ন দেখে। শিবনাথের অধঃপতন লেখক আস্তে আস্তে এঁকেছেন। ব্যবসা আর রাজনৈতিক আশ্রয়ে কলকাতায় গড়ে ওঠা নতুন বাবু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হলেন পারিজাত। কাঠের ব্যবসার সঙ্গে সে নতুন এক ব্যবসা খুলেছে। আশ্রয়হীন মানুষদের আশ্রয়ের বিনিময়ে উপার্জনের এক অভিনব পন্থা। কারো ঘরের অনটনের পাশে পরিবারের বৈভবকে তুলে ধরে লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী শ্রেণিবৈচিত্র্যকে স্পষ্ট করেছেন, মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে নিজের থেকে উঁচুতে থাকা ধনীদের প্রতি যে অনুরাগ থাকে তা পারিজাতের প্রতি বস্তির একাধিক মানুষের মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে এই মূল্যবোধহীন আপোষ প্রবণতার ছাপ পড়েছে নানাভাবে, নানা দিক দিয়ে। এই মূল্যবোধহীন আপোষ প্রবণতার মূল কারণ ভাঙা অর্থনীতি। সময় সংকট এবং সমাজ সংকটের ঠিক জায়গাতেই লেখক গভীর অভিনেবশী দৃষ্টি রেখেছেন। চলমান সমকালের এই প্রেক্ষিতে শিবনাথ নিজেও যেমন চাকরি হারানো এক ডুবন্ত মানুষ, তেমনই বস্তির অন্য সব মানুষগুলোও একই রকম ডুবন্ত মানুষ। পাঁচু ভাদুড়ী তার সেলুনের ওপর ম্যাসাজ ক্লিনিক খুলে বসেছে; সেই ম্যাসাজ ক্লিনিকের নোংরা পাঁকে বিধু মাস্টার তার দুই মেয়ে সমতা ও সাধনাকে রোজগারের আশা নির্বিকারচিত্তে সমর্পণ করে বসে আছেন। রমেশ তার ভাই ক্ষিতীশকে দিয়ে চা দোকান তথা রেস্টুরেন্ট খুলে নানারকম চোরাকারবার চালু করে দিয়েছে আর সেই চোরাকারবারের অবৈধ পাপকর্মে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু একটু করে জড়িয়ে গেছে লরেটো স্কুলে পড়া বেবি। সংসার ও বাস্তবের নিষ্ঠুর প্রয়োজনের কাছেই নিজেকে বলি দিতে সে বাধ্য হয়েছে। এই অবস্থায় ডাক্তারের মেয়ে সুনীতির টেলিফোন অফিসে চাকরির ইচ্ছের কথা জানতে পেরে তার মা প্রভাতকণা প্রীতির মাকে বলেন—

> ''অফিসের কীর্তি শুনতে আর বাকি আছে কিছু। দ্যাশে থাকতে বেবাক শুনেছি। এখানে আইস্যা তো দেখছি। ক্যান আমার ভাতের হাঁড়িতে কি ঠাণ্ডা পড়েছে যে পেটের মাইয়াকে বেশ্যা বানামু।''[৩]

পুরুষ হোক বা নারী, মধ্যবিত্ত মানসিকতা যখন বর্ম হয়ে চেপে বসে থাকে বুকের ওপর, তখন এমন ভাবেই নারীকে দেখে তারা। আসলে নারীর কর্মজীবনকে স্বীকৃতিদিতে যে মানসিকতা লাগে সেটাই এখনো তৈরি হয়নি স্বাধীনতাউত্তর বাঙালি জীবনে। অর্থনৈতিক জাঁতাকলে পিষ্ট মধ্যবিত্ত যখন নিজের আর্থিক ভবিতব্যকে স্পষ্ট দেখতে পারছিল তখন বাধ্য হয়েই নিজের অবস্থান থেকে সরে আসছিল। তাই বাড়ির মেয়েরা এই সময় কারখানায় কাজ করতে যাচ্ছিল। এই উপন্যাসে গেঞ্জি কারখানার উল্লেখ রয়েছে একাধিকবার। সেই গেঞ্জি কারখানার বস্তির মেয়ে বউদের আনার জন্য সে কখনো ব্যবহার করে রমেশকে, রমেশ খুন হয়ে যাবার পর বলাইকে। উপন্যাসের সমগ্র আখ্যানে শিবনাথ তাই কোনওভাবেই আমাদের মন ও মানসিকতাকে এতটুকুও উন্নত করে না, এতটুকুও সমৃদ্ধও করে না। উপন্যাসের সমগ্র আখ্যান বিশ্লেষণ

করলে আমরা আসলে দুটো শিবনাথকে দেখতে পাব। একজন বাইরের শিবনাথ এবং আরেকজন অবশ্যই ভেতরের। বাইরের শিবনাথ শিক্ষিত, সুযোগসন্ধানী এবং একান্তভাবেই আত্মসুখ অভিলাষী। ভেতরের শিবনাথ বস্তির থেকেও নোংরা মানসিকতার।

আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজের বড়ো মর্মব্যাধি সম্ভবত তার আপোষপ্রবণতা। আসলে যখন অন্তর্লোক থেকে অন্তর্জিজ্ঞাসা সরে যায়। মানুষ তখন আর কিছুতেই ঘরের আর বাইরের সামগ্রিক বিনষ্টিতে আপন মনোধর্মের তীক্ষ্ণতা দিয়ে যাচাই করতে পারে না। মনোধর্মের তীক্ষ্ণতাও অপহৃত হয়ে যায়। হতাশা, সংশয়, অবিশ্বাস, স্বপ্নভঙ্গ এসব মিলেমিশে এমন এক নেতিবাচক অস্তিত্ব ও অবস্থান তখন তৈরি হয়ে যায়, যা থেকে বের হয়ে আসাটাও অত্যন্ত কঠিন। 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে এমনই অন্তর্জিজ্ঞাসাহীন পরিব্যপ্ত বন্দিশালা রয়েছে কিন্তু সেই বন্দিশালা থেকে বের হয়ে আসার পথ ও পরিক্রমা নেই কোথাও। জীবনের ভাঁজে ভাঁজে তাই তীক্ষ্ণতার অভাবে, ইচ্ছাশক্তির অভাবে, এমনকি অন্তর্জিজ্ঞাসার অভাবে ময়লা জমেছে, ক্রমাগত ময়লা এসেছে। এই স্তরীভূত ময়লাই আসলে আপোষপ্রবণতা। মূল্যবোধের এই অবক্ষয়ে আত্মসমর্পণ করেছে অমল হালদার কিংবা বিধু মাস্টারেরা। পুরুষদের এহেন বিবেচনাহীন বিনষ্টির ভয়াবহ আঘাত সামলাতে গিয়ে শেষপর্যন্ত এই ময়লার মধ্যেই এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে প্রীতি, বীথি, কিরণ, সুরুচির মতো নারীরা। ফলে সর্বত্রই শুধু আপোষ আর আপোষ। ছোট ছোট জীবনযন্ত্রণার কামড় সমস্ত উপন্যাসে ছড়ানো থাকলেও এই জীবনযন্ত্রণাকে অঙ্গীভূত করে শিবনাথ আত্মসমীক্ষাতেও রত হয়নি। ফলে একসময় মধ্যবিত্তর আপোষপ্রবণতার মধ্যেই তার এক অদ্ভুত ভরাডুবি ঘটে যায় এবং সবচেয়ে বড়ো কথা ভাসমান অবস্থায় এই ভরাডুবিকে সে মেনেও নেয় আপাত এক দুর্বোধ্য স্বাভাবিকতা প্রাণপণে বজায় রেখেই। শুধু শিবনাথ কেন, কম বেশি উপন্যাসের পুরুষ ও নারী প্রায় সব চরিত্রই বাধ্য ভাসমান লক্ষ্যহীন ভরাডুবি দেখবেন বলেই লেখক উপন্যাসে বারো কেবিন বিশিষ্ট জাহাজের প্রতীকী দৃশ্য সংযোজন করেছেন। মধ্যবিত্ত নিজের নিজের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসকে মানতে কোনোদিনই রাজি ছিল না। ফেলে আসা সময় আর নতুন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে মিলিয়ে যে ক্ষণভঙ্গুর বর্তমান স্বাধীনতা উত্তর ভারতে লেখা হয়েছিল এই জীবন্ত কথকতা। মানুষের ইচ্ছে এবং সাধ্যের মধ্যে যে প্রবল বিপ্রতীপ অবস্থান, সেই দূরত্বটাকেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বারো ঘরের সম্বিলিত উঠানে নামিয়ে এনেছেন। কোনো এক চরিত্র নয়, কোনো আলাদা মতাদর্শ নয় লেখক মধ্যবিত্তের সামগ্রিক চেহারাটাকে চিত্রশিল্পীর মতো চাপিয়ে দিয়েছেন পাঠকের সামনে।

তথ্যসূত্র:

১. নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, 'আমার সাহিত্যজীবন আমার উপন্যাস', দেশ সাহিত্য সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৮২, পৃ. ১০৬
২. নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, বারো ঘর এক উঠোন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৮৯, পৃ. ৯
৩. তদেব, পৃ. ৩৮